চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়
শক্তি রায়চৌধুরি
সুব্রত চক্রবর্তী

কমলকুমারের ‘রাজনারায়ণ’ ও দুই পার্শ্বচর,
যাঁদের সহায়তা ছাড়া এই গ্রন্থরচনা ছিল অসম্ভব।

# কৃতজ্ঞতা

অদিতি মজুমদার অন্তরা দেবসেন অন্নদাশঙ্কর রায় অনিশ্চয় চক্রবর্তী অনিরুদ্ধ লাহিড়ী অপর্ণা সেন অবনী বেরা অবন্তী সান্যাল অমরেন্দ্র চক্রবর্তী অমিতাভ দেব চৌধুরী অমিতাভ দাশগুপ্ত অমিয়কুমার মজুমদার অমিয়ভূষণ মজুমদার অরুণ মিত্র অরুণকুমার সরকার অরুণ সেন অরুণাভ বিশ্বাস অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অশোক ঘোষ অশোক মিত্র (আইসিএস) অশোক মিত্র (অর্থনীতিবিদ) অশোক মৈত্র অশীন দাশগুপ্ত অশ্রুকমার শিকদার অসীম রায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আনন্দবাজার পত্রিকা লাইব্রেরি আবদুর রউফ ইন্দ্রনাথ গুহ ইন্দ্রনাথ মজুমদার উদয়ন ঘোষ উৎপলকুমার বসু উৎপল দত্ত এক্ষণ পত্রিকা কমল চক্রবর্তী কল্পনা মুখোপাধ্যায় কার্তিক লাহিড়ী কুশল রায় কেয়া চক্রবর্তী ক্লদ সিঁমো গীতা বসু গোপাল হালদার গৌরকিশোর ঘোষ চতুরঙ্গ পত্রিকা চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় চন্দন গোস্বামী চিত্রভানু মজুমদার চিত্তরঞ্জন মজুমদার চিদানন্দ দাশগুপ্ত জনসেবক পত্রিকা জাতীয় গ্রন্থাগার জনগণনা বিভাগ, প.ব.শাখা দময়ন্তী লাহিড়ী দয়াময়ী মজুমদার দর্পণ পত্রিকা দেবব্রত মুখোপাধ্যায় দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেশ রায় নবনীতা দেবসেন নাতালি সারোত নিখিল সরকার নির্মাল্য আচার্য নীরদ মজুমদার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পল্লব রায় পবিত্র মুখোপাধ্যায় পবিত্র সরকার পরিতোষ সেন পূর্ণেন্দু পত্রী প্রভাতকুমার দাস ফ্রাঁস ভট্টাচার্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি বিভাব পত্রিকা বিষ্ণু দে বিমল কর বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ভবতোষ দত্ত ভাস্কর চক্রবর্তী মনসিজ দাশগুপ্ত মহাশ্বেতা দেবী মার্গারিট মজুমদার মালা চক্রবর্তী মেঘ মুখোপাধ্যায় মৃণাল চট্টোপাধ্যায় মৃণাল সেন যুগান্তর চক্রবর্তী রবি ঘোষ রবি দত্ত রমানাথ রায় রাধাপ্রসাদ গুপ্ত রাধারাণী দেবী ললিতকলা আকাডেমি লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি লোকনাথ ভট্টাচার্য শক্তি চট্টোপাধ্যায় শক্তি রায়চৌধুরী শঙ্খ ঘোষ শম্ভু মিত্র শর্মিলা ঠাকুর শানু লাহিড়ী শামসের আনোয়ার শান্তি বসু শুভ মুখোপাধ্যায়

শিবনারায়ণ রায় শিবশম্ভু পাল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় শৈলেশ্বর ঘোষ সচিত্র ভারত পত্রিকা সমতট পত্রিকা সতীকান্ত গুহ সত্যজিৎ রায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সন্দীপ দত্ত সন্তোষকুমার ঘোষ সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল সমীর সেনগুপ্ত সব্যসাচী সেন সাগরময় ঘোষ সুবিমল মিশ্র সুবীর রায়চৌধুরী সুব্রত চক্রবর্তী সুব্রত রুদ্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সুমিতা চক্রবর্তী সোমা গঙ্গোপাধ্যায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্বপনকুমার পাণ্ডা স্বপনরঞ্জন হালদার স্বপ্না দেব হরিসাধন দাশগুপ্ত হাসান আজিজুল হক।

# ভূমিকা

কলকাতা বাসকালে সকলের কাছে আমি আমার পরিচয় দিতাম, 'কমলকুমার মজুমদারের গবেষক' বলে; ১৯৮৭ সালে, তাঁকে বলতেই, প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, "আর লেখক পেলে না! কমলবাবু লিখেছেনটা কী?"

আমি বললাম, "উনি কিছুই লেখেননি, সেটাই হবে, আমার, কমলকুমার মজুমদার বিষয়ক গবেষণাপত্রের প্রতিপাদ্য।"

কলকাতা গিয়ে দেখলাম, কমলকুমার সম্পর্কে এইরকম মনোভাব প্রায় সকলেরই। তাঁকে লেখক বলে স্বীকার করতেও দ্বিধা অথচ ঝেড়ে ফেলতেও পারছেন না একেবারে। পড়েছেন কি পড়েননি, জানি না, 'অন্তর্জলী যাত্রা' আর 'নিম অন্নপূর্ণা' আর 'গোলাপ সুন্দরী' শ্রদ্ধা এবং অথবা অশ্রদ্ধার সঙ্গে প্রায় সকলেই উল্লেখ করেন— যারা কমলকুমারকে লেখক বলে মেনে নিয়েছেন তাঁরাও, যারা মেনে নিতে পারছেন না তাঁরাও। কমলকুমারের ক্ষমতা আছে কিন্তু লেখক হিসেবে তিনি বিবেচ্য নন; তিনি বাংলাভাষার ঐতিহ্য বিরোধী; তাঁর লেখাপত্র সাহিত্য-বিরোধী; তিনি একজন ধ্বংসপ্রবণ অসাহিত্যিক; তাঁদের মত। তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই-জাতীয় প্রতিক্রিয়াগুলি আমার কমলপ্রেমী যুব-মনে আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল; সন্দেহ করছিলাম নিজেই নিজের পাঠযোগ্যতাকে। তাহলে কি আমার/আমাদের যৌবনের অতুলনীয় আবিষ্কার কমলকুমার তেমন কিছু আহামরি লেখক নন? তাহলে কি আমি/আমরা পাঠক হিসেবে খুব একটা উচ্চমানের হতে পারিনি?

এই নঞর্থকতা ও সংশয়গুলিই আমাকে, সেই যৌবনকালে আরো বেশি জেদি-অনুসন্ধানী করে তোলে তাঁর বিশিষ্টতাকে খুঁজতে; আসলে, নিজের পাঠযোগ্যতাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে। স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটি চলে এইসব ভিন্ন মতগুলিকে ধরেই; এবং এভাবেই লেখক কমলকুমারের সমান্তরালে উঠে আসেন ব্যক্তি-কমলকুমার ও শিল্পী-কমলকুমার। পূর্ব-পাঠের চমকের পাশে এইসব সংশয়গুলির ভেতরই, এইসব যুক্তি-অযুক্তিগুলিকে গ্রহণ-বর্জনের ভেতরই, নিজের মতামতকে, নিজের পাঠযোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করার অস্ত্রও খুঁজে পেয়েছিলাম। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে কমলকুমার চর্চাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছি যাবতীয় উপেক্ষা অবজ্ঞাকে তুড়ি মেরে, কেবলমাত্র

নিজের পাঠ-উপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠা করতে। এই গ্রন্থটি সেই খোঁজাখুঁজির প্রাণান্ত প্রয়াসের ফল যুগপৎ কমলকুমারের লেখক হবার প্রস্তুতি-পর্যায়গুলির পরিসর নির্ণয়ে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যেরই বিস্তারিত আলোচনা ও পরিচয়।

জনগণনা বিভাগে নিযুক্তি কমলকুমারের সাহিত্যিক জীবনে মস্ত একটি সুযোগ, তিনি বঙ্গদেশের নিত্য কাঠামো খুঁজে পেয়েছিলেন কাজটির মধ্যে। তার পূর্বে, শিল্পের নানা বিভাগে, স্বল্প সময়ের জন্য হলেও, আত্মনিয়োগের ফল ফলেছিল সাহিত্যশরীর ও আত্মায় সঙ্গীত চলচ্চিত্র নাটক নৃত্য চিত্রকলার অসাধারণ অনন্য প্রয়োগে, যা বাংলা সাহিত্যে ছিল অভিনব। এমন কোনো লেখকের সঙ্গে আমার আজ পর্যন্ত পরিচয় ঘটেনি, যিনি প্রতিটি লেখায় নিজের অধিগত সাফল্যকে তুড়ি মেরে, হঠিয়ে, একেবারেই নতুন আঙ্গিকে, লিখছেন; —কমলকুমার মজুমদার এই একটি কারণেই আমার কাছে বিস্ময়, যিনি নিজের অর্জিত সাফল্যকে নিজেই ভেঙে খানখান করে নবতর নিরীক্ষার দিকে পা বাড়ান। নিজের বিরুদ্ধে নিজেই অস্ত্র সাজান —এমন লেখক আর কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই।

সমস্ত শিল্পকলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও, শেষের দিকের রচনায় অন্যান্য আর্ট ফর্ম বর্জিত হলেও নাটককে তিনি ছাড়েননি। চিত্রকলা চর্চা করছেন আজীবন কিন্তু সাহিত্যে চিত্রকলার প্রয়োগ বর্জন করেছেন, নাটককে নয়। ১৯৭৬ সালেও বলছেন যদিও, "অঙ্কন শিল্পে, যাহা নিরবয়ব গঠন বলা যায়, তাহাতে গভীরতা আছে, সেই গভীরতা সাহিত্যে আলো ও অন্ধকার চেতাইত হইবে" তবুও চিত্রকলা বর্জন করলেন অথচ নাটক থেকে তিনি, লেখক কমলকুমার মজুমদার, কখনোই বেরিয়ে আসতে পারেননি, বরং নাটককেই বেশি অবলম্বন করেছেন।

'আমরা হই নাটকের লোক' তিনি বলেছেন।

কী লিখেছেন, খোঁজার পাশাপাশি, স্বাভাবিকভাবেই, কী কী শিল্পমাধ্যমে তিনি সাঁতরেছেন, জানতে, আমাকে বহুদিন যাবৎ অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। এখনো অব্যাহত অনুসন্ধানে আছি, কেন, শেষের দিকের লেখায় নাটক ব্যতীত অন্যান্য শিল্পমাধ্যম পরিত্যাজ্য বলে মনে করছেন, তার উত্তর জানতে। খোঁজাখুঁজির প্রাথমিক পর্যায়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দৈত্যকাহিনি' রচনাটিই আমাকে প্ররোচিত করে শিল্পী কমলকুমারের অনুসন্ধানে। প্রকৃতপ্রস্তাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রথম অন্য-কমলকুমারের সন্ধান দেন। তিনিই প্রথম নাট্যপরিচালক

ও চিত্রশিল্পী কমলকুমারের কথা আমাদের জানালেন অনেক বিস্তৃত আকারে। অনেকেই ঠারেঠোরে বলেছিলেন শিল্পী কমলকুমারের কথা। কিন্তু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথাটি অনন্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মানুষ কমলকুমারকেও চিনতেন অন্যান্যদের চেয়ে বেশি। তবে একটা সময় পর্যন্ত। 'দৈত্যকাহিনি' অনেক কথা বলে, হয়তো কিছুটা মিথ কিছুটা মিথ্যে, তবুও। ব্যক্তিগতভাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্তা হলেও 'দৈত্যকাহিনি'কে ছাড়িয়ে আর নতুন কিছু দিতে না পারলেও, তিনি, কমলকুমারের যে পরিচয়টি জানিয়েছেন, তাকে ধরেই আমি পূর্ণাঙ্গ কমলকুমারকে খুঁজে পাই।

দ্বিতীয় যে লেখাটি আমাকে অভূতপূর্ব সহায়তা দিয়েছে, সেটি হলো রাধাপ্রসাদ গুপ্তের 'কমলকুমার মজুমদার: কিছু পুরনো কথা'। 'শব্দপত্র' কমলকুমার মজুমদার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল লেখাটি। যুবক কমলকুমারের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর কোনো রচনায় উঠে আসেনি। লেখাটি পড়ে আমি রাধাপ্রসাদবাবুর কাছে ছুটে যাই। তাঁর রচনায় উল্লিখিত প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও খুব যে সফল হয়েছি বলা যাবে না। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় ও রাধাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে কথা বলে যেটুকু ধারণা হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে, তাঁর যৌবনকাল পর্যন্ত কমলকুমার বিশেষ কোনো সাহিত্য স্রষ্টা না হয়েও কলকাতার আঁতেল সমাজে 'আঁতেল-শিরোমণি' আখ্যাটি পাচ্ছেন কেবলমাত্র আড্ডাকে কেন্দ্র করে। আড্ডাতেই তিনি তাঁর পাঠপরিধি, উইট, বিদ্যাবুদ্ধির প্রচার ও প্রসার ঘটাচ্ছেন, নিয়মিত উপহার পাচ্ছেন নিত্যনতুন বন্ধু, সাথী, সহযোগী —তারা কেউ কেউ হয়ে উঠছেন সারা জীবনের সঙ্গী ও শুভানুধ্যায়ী। কেউ কেউ নিজের আখের গোছাতেও তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিকে কাজে লাগাচ্ছেন। ১৯৪৭-এর পর আজীবনের দারিদ্র্যপীড়িত কমলকুমার এই পর্বে জীবনযুদ্ধে ঠিক-বেঠিক কোন কোন স্রোতে নিজেকে ভাসাতে বাধ্য হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত মেলে রাধাপ্রসাদ গুপ্তের ভাষ্যে। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত প্রাথমিক পর্যায়ে সহযোগিতা করলেও, তাঁর প্রদেয় তথ্য ও পরস্পর বিরোধী মন্তব্যগুলি অসংখ্য প্রশ্নের জন্ম দিলে, বিব্রত তিনি, আমাকে এড়িয়ে চলতেন।

সত্যজিৎ রায়ের 'কমলবাবু' লেখাটিও ১৯৪৭-পরবর্তী বিবাহিত কমলকুমারের কৃচ্ছ্রতার পরিচয় দেয় এবং এ লেখাতেই কমলকুমার মানুষটির চরিত্রের আরো কয়েকটি দিক, যা আমরা জানতাম না, সত্যজিৎ জানান। 'কমলবাবু' খুব সাবধানী লেখা। লেখাটির পরতে পরতে ফাঁক, সেই ফাঁকগুলি জানতে সত্যজিৎ রায়ের মুখোমুখি হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেও ফাঁকগুলিকে পূরণ করতে পারিনি। জানতে পারিনি 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে

কমলকুমারের কোনো ভূমিকার কথা। তিনি কিছুই স্বীকার না করলেও, আমি অন্যভাবে সে সব আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সফল হইনি। 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী যথা সুব্রত মিত্র, 'পথের পাঁচালী'র ফোটোগ্রাফার; করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বজয়া চরিত্রাভিনেত্রী তখনও জীবিত। তাঁদের সঙ্গে কোনোভাবে যোগাযোগ করা গেলেও সুব্রত মিত্র কিছু বলতে অস্বীকার করলেন। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন যতবার নির্দিষ্ট হয়েছে ততবারই তা বাতিল হয়ে গেছে। ফলে আমরা কোনো কংক্রিট প্রমাণ পাচ্ছি না 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে কমলকুমারের কী ভূমিকা ছিল! অথচ কোনো-না-কোনো সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে কমলকুমারের বিরাট ভূমিকা ছিল। তিনি আধুনিক চলচ্চিত্র-চিন্তক হওয়া সত্ত্বেও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেন কেন, —এই অমীমাংসিত বিষয়টি আবিষ্কার করতে আমার অক্ষমতা, ভবিষ্যৎ-গবেষকের জন্য বিষয়টি তোলা রইলো।

পরিতোষ সেন আড্ডাপ্রিয় চিত্রকলা-বিশেষজ্ঞ কমলকুমারের কথা বলেছেন বহু সাক্ষাতে, বহুবার। মধ্য বয়সের কমলকুমার মানুষটির ঘনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন শান্তি বসু, কিছুটা অনিরুদ্ধ লাহিড়ীও। 'সমতট' পত্রিকায় প্রকাশিত শান্তি বসুর লেখা 'বাবু কমলকুমার মজুমদার' রচনাটি বিতর্কিত কিন্তু তথ্যে ভরপুর। কমলকুমার মজুমদারের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে এই লেখাটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। টুকরো টুকরো ভাবে অনেকেই কমলকুমারের নানা সময়ের কথা জানিয়েছেন। খণ্ড খণ্ড এইসব স্মৃতিকথাগুলিই আমাকে প্ররোচনা দিয়ে গেছে আরও তৃণমূল স্তরে অনুসন্ধানের। কমলকুমার-পত্নী, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র, সহকর্মী, খালাসিটোলা-সঙ্গী, এককথায়, যাঁরা যতটুকু কমলকুমারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, প্রত্যেকেরই মুখোমুখি বসে কথা বলার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য। সবসময় যে সফল হয়েছি, সঠিক তথ্যটি সংগ্রহ করেছি, এমন দাবি করতে পারি না কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি।

অনুসন্ধানের প্রাথমিক পর্বেই আমার নজরে এসেছিল, কমলকুমার কলকাতায় তিন ভাগে বিভক্ত:

এক. কমলকুমারের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল,

দুই. কমলকুমারের লেখার তীব্র সমালোচক ও বিরোধী,

তিন. কমলকুমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু তিন জনকেই আমার চাই। সমকালীনতার তাপ-শীতলতার ভেতর দিয়েই চিরকালীন কমলকুমারকে বুঝে নিতে হবে। প্রথমেই আমি বেছে

নিয়েছিলাম কমলকুমারের লেখার তীব্র সমালোচকদের। আমার সিক্স সেন্স বলছিল, বিরুদ্ধবাদীদের কথা থেকেই কমলকুমারের সৃষ্টির সদর্থক দিকগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের বোঝানো হয়েছিল, টেক্সট মুখ্য, লাইফের কোনো প্রয়োজন নেই সাহিত্য বিচারে। এই ধারণাটি যে ভ্রান্ত, কমলকুমার-অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাঁর জীবন না জানলে জানতেই পারা যেত না, কোন তাপ-উত্তাপ থেকে তাঁর সাহিত্যে শিল্পের নানা শাখার উজ্জ্বল উপস্থিতি। জানা যেত না কেন তিনি সমস্ত শিল্পচর্চায় অসম্ভব উদ্যমী হয়েও, অনেকটা সময় ব্যয় করেও সব ছেড়েছুঁড়ে, শেষে, সাহিত্যে এসে থিতু হন; জানা যেত না বঙ্গদেশের নিত্য কাঠামো তাঁর রচনাকে কীভাবে উজ্জীবিত করছে। প্রতিদিন আবিষ্কার করছি রবীন্দ্রনাথের পর এত বিচিত্র শিল্প-রসের রসিক কমলকুমার ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই এ-বঙ্গে, সম্ভবত ভূ-ভারতেও হাতে গোনা। চিত্রকলা, লোকচিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, হারিয়ে যাওয়া বঙ্গ সংস্কৃতি, উনিশ শতক, চলচ্চিত্র তাঁর রচনার পরতে পরতে।

কমলকুমারের বাড়ির পরিবেশ কতটা সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিল সঠিক তথ্য আমি পাইনি। কমলকুমার লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দিলে বাড়ির বড়ো ছেলে, গড়পড়তা মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রধান হিসেবে তাঁর বাবা প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সঙ্গে কী ব্যবহার করতেন আমি জানি না। কমলকুমারের ছোটবোন শানু লাহিড়ীর মতামত অনুসারে মনে হতে পারে, কমলকুমার লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দেওয়ায় তাঁর বাবা-মা খুশিই হয়েছিলেন। বৈপ্লবিক ব্যাপার বলে গ্রহণ করেছিলেন। রাবীন্দ্রিক ব্যপার বলে মনে করেছিলেন। চাকরিজীবী নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের এরকম লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দেওয়া আর যাই হোক, গৌরবের বিষয় হতে পারে না। শান্তিনিকেতনে কমলকুমারের মেজোবোন গীতা এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারেননি, নীরদ মজুমদার খুব বেশি সময় দিতে পারেননি, যেটুকু সময় তিনি দিয়েছেন সেইসব সাক্ষাৎকারে বিষয়টি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়নি; বড়োবোন বাণী অসুস্থ থাকায় কথা হয়নি সেরকম। বাকি দু-ভাই অমিয় আর চিত্তরঞ্জন, সিডলি হাউসে, কমলকুমার সম্বন্ধে তাঁদের অনীহা লুকোননি। আমার কৌতূহলকে তাঁরা অনধিকার-চর্চা হিসেবে নিয়েছিলেন। বার কয়েক রিখিয়া গিয়েও খুব একটা তথ্য পাইনি। বালক-কিশোর-যুবক কমলকুমার-জীবনের যাবতীয় তথ্যের জন্য পুরোটাই নির্ভর করতে হয়েছে স্বভাবতই শানু লাহিড়ীর ওপর, তাঁকেই সবসময় হাতের কাছে পেয়েছিলাম। মোটমাট আমার অনুসন্ধানে আমি বুঝেছি, কমলকুমার ব্যক্তিমানুষটি জটিলতায় ভরা। তাঁর নিত্যসঙ্গীদেরও তিনি বেশ ধাঁধার মধ্যে রেখেছিলেন। যাঁরা এখন কমলকুমারের 'ছায়াসঙ্গী',

‘নিত্যসহচর’ বলে দাবি করছেন নানা রচনায়, স্মৃতিচারণায়, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা একটি একটি খণ্ডিত সময়ের সহচর মাত্র। তাঁরা খণ্ডিত অভিজ্ঞতা দিয়ে পূর্ণ-অভিজ্ঞার কমলকুমারকে আঁকছেন, ফলে ভয়াবহ রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, যা পরবর্তী প্রজন্ম কিছুতেই সঠিক কমলকুমারকে চিনতে পারবেন না, সঠিক তথ্যটি না জানলে।

রবি ঘোষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় বিড়লা তারামণ্ডলের সভাঘরে। তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া আমার অনেক অমীমাংসিত জটিল জটের সমাধান করে দিয়েছিল। হঠাৎ সেই দেখা, কিন্তু রবিদা যতদিন বেঁচেছিলেন প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হতো তারপর। রবিদা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই সময় আমার কথা বলার খুব দরকার ছিল। কমলকুমার কত বড় মাপের নাট্যপ্রতিভা ছিলেন, খালাসীটোলার ভক্তরা এটা বোঝাতে গিয়ে এমন সব কথা বলছেন, যা শুনে আমারও কেমন খটকা লাগছিল। অথচ প্রমাণের অভাবে তা মেনেও নিতে হচ্ছে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কমলকুমারের নাটকে কাজ করার অভিজ্ঞতা-কথা ও শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেওয়ার দায় নিয়েছিলেন। নাটক বিষয়ে যথাযোগ্য জ্ঞাতব্য তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, যিনি ব্যক্তিগতভাবে কমলকুমারের ছাত্রও, তাঁর পরিচালিত নাটকের অভিনেতাও।

‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় ‘পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক…’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন নবনীতা দেবসেন, সেটি ছিল কমলকুমারের রচনার তীব্র সমালোচনা। নবনীতা ব্যক্তিগতভাবে কমলকুমারকে একটি চিঠি লিখে ওই প্রবন্ধ লেখার জন্য প্রায় ক্ষমাই চেয়ে নিয়েছিলেন। এই চিঠির সূত্রে নবনীতা দেবসেনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। রাত্রি অধিক হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি তাঁর বাড়িতেই আমাকে আশ্রয় দেন। সে রাতে, তাঁর বাড়িতে, আমার জন্য কী বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, আমি বিন্দুমাত্র অনুমান করিনি। নিয়ে এলেন তেতলায়, আলাপ করিয়ে দিলেন রাধারাণীদেবীর সঙ্গে।

রাধারাণীদেবী আমাকে কমলকুমারের প্রথম যৌবনের সাহিত্য সম্পর্কে আমার ধারণাটি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। ‘উষ্ণীষ’ পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর সাক্ষাৎকারটির পেছনের কাহিনি জেনেছিলাম সেদিন।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলে কমলকুমারের প্রকৃত অবস্থানটিও সে রাতেই পরিষ্কার হয়। অন্তরা, নবনীতাদির বড়ো মেয়ে, সাউথ পয়েন্টের ছাত্রী। তিনি আমাকে শিক্ষক-কমলকুমারের যে তথ্য দেন তা কমলকুমারের অনুচরেরা, যারা তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী, স্কুলের সহকর্মী, তাঁরাও দিতে পারেননি।

আজকের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, নবনীতাদির আন্তরিকতার দিকটিকে। একেবারেই অজানা একটি যুবককে, আমি তখন এমএ প্রথম বর্ষের ছাত্র, কারো রেফারেন্স ছাড়াই সে রাতে তিনি তাঁর ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

নবনীতাদিরা সেই বিরল প্রজাতির হোমো স্যাপিয়েন্স ও শিক্ষক, যাঁরা আজ বিলুপ্ত!

'প্রতিক্ষণ'-এ চাকরির সুবাদে পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে আলাপ, তার কিছুদিন পরই তিনি 'প্রতিক্ষণ' ছেড়ে দিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড় অচ্ছেদ্য সম্পর্কটি রয়ে গিয়েছিল কমলকুমারের, তাঁর কমলদার জন্য।

দক্ষিণ কলকাতার নগরায়ন আর উত্তর কলকাতার পুরনো ঐতিহ্য — দুটির দ্বন্দ্ব কমলকুমারের মনে কীভাবে কাজ করেছিল, পূর্ণেন্দুদা, আমার মেস, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিটের কমলা বোর্ডিং-এ বসে বলেছিলেন। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন অনেক অকুস্থলে। বাবু কলকাতা, বনেদি কলকাতাকে না জানলে কমলকুমারের 'গোলাপ সুন্দরী' পর্যায়ের রচনাগুলির রস ঠিক আস্বাদন করা যাবে না—তাঁর মতামত। বিবাদী বাগ থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত কলকাতা কমলকুমারের আভিজাত্যের ভূগোল। তার বাইরের কলকাতা মেকি, একটু বেচাল হলেই তার ভেঙে পড়ার প্রবল আশঙ্কা। "চাষার মত, নেটিভের মত"। একই সঙ্গে লোভ আর ঘৃণার প্রকাশ কলকাতা ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে কিনা জানি না। কলকাতার সবাই লর্ড ক্লাইভ, পলাশীর যুদ্ধ করার জন্য সুযোগ খুঁজছে, অনুসন্ধান করছে মিরজাফরের। যাঁদের শেকড় সুটানুটি-গোবিন্দপুরের সঙ্গে বাঁধা তাঁরা ছাড়া সবাই তো আসলে ঔপনিবেশিক। কলকাতা যদি কিছু দ্রুত শেখায় তা হলো অবজ্ঞা আর ঘৃণা করতে পারা। যারা উপনিবেশে জাঁকিয়ে বসেছে আর যারা উপনিবেশমুখী, এই দ্বন্দ্বটি কমলকুমারের সাহিত্যের প্রধান সুর। এই সুরটি প্রকাশের জন্য তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল নুতন ভাষা ও সৃষ্টির। প্রচলিত ভাষায় 'সাহেব বিবি গোলাম' হতে পারে, 'সেই সময়' হতে পারে, 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' হতে পারে না।

কমলকুমার আমাকে কলকাতা চিনিয়েছিলেন। সঠিকভাবে কমলকুমার পাঠ করার জন্যই কলকাতার অলিগলি পায়ে হেঁটে দেখেছি। লাভও হয়েছে বহুরকমভাবে। আমার আর্থিক টানাটানির সময় পায়ে হাঁটা অভ্যাসের জন্য ধর্মতলা থেকে কলেজ স্ট্রিট হেঁটে আসতাম মালঙ্গা লেনের অলিগলি পথে। পরে যখন দমদম রোডে ঘর ভাড়া নিই, শিয়ালদহ আসার সংক্ষিপ্ত হাঁটাপথও আবিষ্কার করি। কলকাতার গলিতে কত বিচিত্র সব জীবন পড়ে আছে! উত্তর কলকাতার সবটাই গলি, গলি নিয়েই উত্তর কলকাতা।

কমলকুমারের ওপর কাজ না করলে কলকাতার কিছুই চিনতে পারতাম না।

পূর্ণেন্দুদা কমলকুমার বিষয়ক বইটির প্রচ্ছদ করবেন এরকম কথা ছিল। বইটি প্রকাশ করতে চেয়েছিল 'কবিতীর্থ'। শেষ পর্যন্ত বাজেটে কুলোলো না বলে আর প্রকাশ করতে পারল না উৎপল ভট্টাচার্য। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ আঁকাও হলো না। আজ যাব কাল যাব করে উৎপল প্রচ্ছদ আঁকিয়ে নিতে পারল না। পূর্ণেন্দুদা তো তারপর আমাদেরই ছেড়ে চলে গেলেন।

অরুণ মিত্র ছিলেন আমার গবেষণা কালে ফরাসি সাহিত্য ও ইতিহাস সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়ের মুস্কিল আসান তৎসহ ছিলেন কলকাতায় আমার অভিভাবক। ন্যুভ রোমা বিষয়টা অরুণদা যেমন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এই সাহিত্য আন্দোলন বিষয়ে একাধিক অনুবাদগ্রন্থও যোগান দিয়েছিলেন। নাতালি সারোত আর ক্লদ সিঁমোর সঙ্গে পত্র বিনিময়ের ব্যবস্থাও করে দেন। নাতালি সারোত ক্লদ সিঁমোর সঙ্গে আমি টেলিফোনে কথা বলেছি অরুণদার সৌজন্যে।

কমলকুমার সারা জীবন নাটক করেছেন, তাছাড়া শম্ভু মিত্রের 'ছেঁড়া তার' নাটকটির আলোচনা করেছিলেন কমলকুমার। কমলকুমার একটু সমালোচনা করছিলেন নাটকটির। কমলকুমারের সমসাময়িক শম্ভু মিত্রের মতো নাট্যব্যক্তিত্ব কমলকুমারের নাটক সম্পর্কে কী বলেন জানবার প্রয়োজন ছিল। অরুণদাকে বলতে, তিনি বলেছিলেন, যাওয়ার খুব দরকার না থাকলে যাবার দরকার নেই। আমি কথা শুনিনি। গিয়েছিলাম। আমার নিবেদন শুনে শম্ভু মিত্র আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঘর থেকে। স্বগতোক্তির মতো বলেছিলেন, ও নাটকের কী বোঝে!

"শুনলে না তো?" অরুণ মিত্র বলেছিলেন, সবটুকু শোনার পর।

কমলকুমার চর্চায়, আমার পরম প্রাপ্তি শক্তি রায়চৌধুরী ও চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁরা দুজন ছাড়া, আমার অভিজ্ঞতায়, প্রকৃতপক্ষে বাকিরা কেউই সঠিক কমলকুমার-তথ্যভাণ্ডার নন।

শক্তি রায়চৌধুরীর কথা আমাকে জানান 'কবিতীর্থ' পত্রিকার সম্পাদক উৎপল ভট্টাচার্যের জামাইবাবু, আমার চির-হিতাকাঙ্ক্ষী মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। এক মাতাল অপর মাতালের ঠেক জানেন। খালাসিটোলার পানসঙ্গী-শক্তি রায়চৌধুরীর মুখে তাঁর প্রিয় 'কমলদার' কথা শুনে থাকবেন মৃণালদা। শক্তি রায়চৌধুরী আমাকে যা দিয়েছেন, তুলনা করে বললে, বলতে হয়, সহযোগী অসহযোগী সমস্ত মানুষের প্রদেয় তথ্য একাট্টা করলেও তাঁর প্রদেয় তথ্যের ভার তার চেয়েও বেশি।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ই, বন্ধু যাকে বলে, প্রকৃতপ্রস্তাবে কমলকুমারের তিনি তাই।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই ধরনের বন্ধু যিনি সুখে-দুঃখে-বিষাদে-আনন্দে কমলকুমারের সঙ্গে আজীবন আমৃত্যু সেঁটে ছিলেন। উপার্জনের সন্ধান দিচ্ছেন, বাড়ির সন্ধান দিচ্ছেন, নিত্যনতুন গল্প উপন্যাস রচনায় উৎসাহ দিচ্ছেন, সত্যজিৎ-বিষ্ণু দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও মত বিনিময়ে মধ্যস্থতার ভূমিকা নিচ্ছেন। জনগণনা বিভাগে চঞ্চলবাবুর সুপারিশেই অশোক মিত্র কমলকুমারকে চাকরিটি দেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে ব্যক্তিগত স্তর পর্যন্ত তাঁদের অখণ্ড বন্ধুতা কমলকুমারের জীবনী লেখায় ষোল আনার উপর আঠারো আনা উপাদান। দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে হয়, কমলকুমারকে কমলকুমার হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকাটি নিচ্ছেন চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। চঞ্চলবাবু আমাকে কমলকুমারের লেখাপত্র, তাঁকে লেখা চিঠিপত্র দিয়েছিলেন অনেক। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোলাকাত না হলে অর্ধেক কমলকুমার অধরা থেকে যেতেন।

এই দুজন ছাড়া অপর আর এক তথ্যভাণ্ডার, যিনি আমার কমলকুমারের ওপর গবেষণা শুরু করার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান, কমলকুমারের একান্ত স্নেহের সুব্রত চক্রবর্তী-প্রযত্নে তাঁর স্ত্রী মালা চক্রবর্তীর সাহায্য ছাড়া এই কাজটি করা ছিল অসম্ভব। সুব্রত চক্রবর্তীর যাবতীয় কমলকুমার সংগ্রহ দেখার ও ব্যবহারের সুযোগ দেন মালা চক্রবর্তী। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শক্তি রায়চৌধুরী ও সুব্রত চক্রবর্তীকে বইটি উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কমলকুমার চর্চায়, কমলকুমার মজুমদারকে জানতে, বহুবার, বহু ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত বিচিত্র আচরণের পরিণামই এই গ্রন্থটির রচনাসম্ভব কাহিনি। পাঠক গ্রহণ করলেই সকল শ্রমের সার্থকতা।

সকলকে প্রণাম। কৃতজ্ঞতা।

আসানসোল
১৫.০১.২০২৫

**হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়**

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| প্রত্যক্ষর সত্য দিয়া | ২১ |
| লুপ্ত পূজাবিধি | ৪৫ |
| খেলার প্রতিভা | ৬১ |
| বঙ্গীয় লোকমতি | ৭৫ |
| আবিষ্কারের উগ্রতা | ১০৩ |
| যেমন সে ছন্দবিধি | ১১৭ |
| অলিখিত অপেরার মহতী দৃশ্য | ১৩৭ |
| চিত্রাত্মক উপকথার ভূমিকা | ১৫৯ |
| ধৈবতের গাম্ভীর্য | ১৭৩ |
| অভিনব ব্রতকথা | ১৮৭ |
| কালানুক্রমিক জীবনপঞ্জী | ১৯৯ |
| কীর্তিপঞ্জী | ২২৯ |
| কমলকুমার মজুমদার গ্যালারি | ২৩৫ |